ড. এ. কে. এনামুল হক

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ক্ষয় রোধ করা জরুরি

সম্ভবত এই সপ্তাহটি ছিল সুসংবাদের সপ্তাহ। টিকা চালু হয়েছে। এটি একটি সুসংবাদ। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সর্বকালের রেকর্ড হয়েছে, অর্থাৎ শতভাগ পাস ছিল আমাদের দ্বিতীয় সুসংবাদ। দক্ষিণ এশিয়ায় একমাত্র বাংলাদেশেই উন্নয়ন মাত্রার শিখরে, অর্থাৎ আমাদের প্রবৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ—এটি ছিল আমাদের তৃতীয় সুসংবাদ। এরই মাঝে কথা হলো কিছু পুরনো বন্ধুর সঙ্গে। এদের দুজন কানাডীয়, একজন এন্টিগুয়ার ও অন্যজন ত্রিনিদাদের। তারা কিন্তু অতটা সুখবর দিতে পারেনি। তাদের মধ্যে ছিল হতাশা। তাদের গল্পই বলি, তাহলে আমাদের ভাগ্য কতটা সুপ্রসন্ন তা বুঝতে পারবেন।

কানাডার বন্ধুর কথা দিয়ে শুরু করি। প্রায় ৮০ শতাংশ কানাডিয়ান ট্রাম্পকে ভালো চোখে দেখেনি। তাদের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ট্রাম্পের সুমধুর সম্পর্ক ছিল না। প্রতিটি সভায় তাদের ঝগড়া ছিল চোখে পড়ার মতো। তবে কানাডার অর্থনীতি পুরোপুরি যুক্তরাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী, তাই তাদের ভাষায়, আমাদের সবসময় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষেই থাকতে হয়। যে-ই ক্ষমতায় থাকুক না কেন। অথচ বাইডেন আসামাত্রই কানাডার ওপরই প্রথম খড়্গ নেমে এসেছে। তিনি ক্ষমতায় আসার প্রথম দিনেই ২০১৭ সালে করা কানাডা-যুক্তরাষ্ট্রের স্বাক্ষরিত এই পাইপলাইনের কাজ স্থগিত করেছেন। তাতে কানাডার অনেকটা ক্ষতি হয়েছে। বহু অর্থ এরই মধ্যে বিনিয়োগ হয়ে গেছে। যদি ভাবেন ট্রাম্প হয়তোবা কাজটি সঠিক করেননি তা কিন্তু নয়। ২০১০ সাল থেকে ২০১৬—এই পাইপলাইনের কাজের তিন পর্ব শেষ হয়েছিল। অর্থাৎ উদ্যোগটি এসেছিল ওবামা থাকাকালীনই। এবার চতুর্থ পর্বের কাজ শুরু হয়েছিল মাত্র। অর্থাৎ যে কাজে ওবামা কিংবা বাইডেন জড়িত ছিলেন, তারই চতুর্থ পর্বের কাজে সেই বাইডেনই বাধা দিলেন! বুঝতেই পারছেন রাজনীতি জটিল বস্তু। অথচ কানাডা যুক্তরাষ্ট্রের হয়েই চীনকে উত্যক্ত করেছিল এবং হুয়াউইর প্রধান এক নির্বাহীকে এখনো আটক রেখেছে। বুঝতেই পারছেন। কানাডা অসহায়ের মতো তার পার্শ্ববর্তী দেশের দিকে তাকিয়ে আছে। কিছু করার নেই। রাজনৈতিক ইতিহাস বলে আন্তর্জাতিক বিষয়ে কানাডা এ-যাবৎ কেবল যুক্তরাষ্ট্রের বি-টিমেরই দায়িত্ব পালন করে গেছে। কিউবা সংকটের সময় কানাডা এ কাজ করেছে। ইরান সংকটেও তা-ই করেছে। শুধু তাই নয়, কানাডা জি৭ দেশের সভায়ও একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রের বি-টিমের মতন কাজ করে। তবে সেখানে প্রকৃত বি-টিম যুক্তরাজ্য। বুঝতেই পারছেন মুক্ত কানাডিয়ানদের মন শান্তিতে নেই। সবসময়ই তারা কেন হয় যুক্তরাষ্ট্রের বি-টিম! নাগরিকদের ভালো লাগে? নিশ্চয় নয়। তবে তার বিনিময়ে কানাডা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আর্থিক সম্পর্ক উন্নয়ন করে। অর্থাৎ বিশ্ব রাজনীতিতে বি-টিমের কাজের বিনিময়ে কানাডা নিজের অর্থনীতিকে সচল রাখে। ভুলে গেলে চলবে না যে কানাডার প্রায় ৯০ শতাংশ রফতানি হয় যুক্তরাষ্ট্রে। ভূরাজনীতি ও অর্থনীতির এমনতর সংযোগ অনেকের জন্য ভেবে দেখার মতো। বলছি এই কারণে যে কানাডা কিন্তু গরিব দেশ নয়। তদুপরি ভৌগোলিক অবস্থান তাদের অর্থনীতিকে বিপাকে ফেলেছে। তাদের একমাত্র প্রতিবেশী যুক্তরাষ্ট্র।

কথা প্রসঙ্গে এসে গেল বাংলাদেশ। বাংলাদেশের অগ্রগতির প্রতি নজর সবারই। তাই আলোচনাচক্রে এসে পড়ল পারমাণবিক জ্বালানি শক্তির কথা। যখন জানতে পারল রাশিয়ার প্রযুক্তিতে আমরা তা করছি, তখনই ভুরু কুঁচকে গেল! কেন? রাশিয়ার প্রযুক্তি কি নির্ভরযোগ্য? ভাবলাম জিজ্ঞেস করি, কেন ভুরু কুঁচকালে? কিন্তু থেমে গেলাম। কারণ উত্তর আমেরিকায় বসে আর কার প্রযুক্তির কথা তাদের মনে থাকবে? আবার ভাবলাম আমাদের বালিশের কাণ্ড কি তারা জানে? মনে মনে ভয়ই করছিল। ভাবলাম একবার বলি আমাদের বিপদ প্রযুক্তিতে নয়, আমাদের বিপদ হবে আমাদের দুর্নীতিতে। বিষয়টি খোলাসা করি। পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা বাংলাদেশের একটি দুগ্ধসমৃদ্ধ এলাকা। দেশের দুধ উৎপাদনের প্রাণকেন্দ্র পাবনা-সিরাজগঞ্জ। তাই সেই এলাকায় বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ ও বিদ্যুৎকেন্দ্র এলাকায় ঘাস উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে আমাদের কী অবস্থা হতে পারে তা নিয়ে আমি অনেক চিন্তিত ছিলাম। ঢাকার পাশে পাগলায় বর্জ্য শোধনাগারের পুকুরে মাছ উৎপাদন নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও তা করা হয় এবং বাজারে বিক্রয় হয় বলে মাঝে মাঝে পত্রপত্রিকায় তার সংবাদ শুনে শিউরে উঠি আর ভাবি এবার কী হবে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে? মাছের বদলে সেখানে কি শুরু হবে ঘাসের বাণিজ্য? আমার এক বন্ধু পরমাণু বিজ্ঞানী, তিনি আশ্বাস দিয়েছেন। তার ভাষায়, ওই ঘাস ব্যবহার করা যাবে। অর্থাৎ তিনি বলছেন যে ঘাসের বাণিজ্য চলবে। তার মতে, বিকিরণের মাত্রা সহনশীল। তবে আমি নিশ্চিত নই। আমার জানামতে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ৮০ কিলোমিটারের মধ্যে বছরে শূন্য দশমিক শূন্য ১ মিলিরেম মাত্রায় বিকিরণ থাকে। এই মাত্রা হয়তোবা এক্স-রে মেশিনের বিকিরণ মাত্রার সমান। তবে এক্স-রে আমরা বছরে ৩৬৫ দিন করি না কিংবা তাই বলে এক্স-রে মেশিনের চালক তার সুরক্ষা ব্যবস্থা ফেলে দেন না। তবে যাই হোক, বিকিরণের এই মাত্রা রাশিয়া কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি দুটোতেই সত্য। তত্ত্বগতভাবে এই বিকিরণ সহনশীল মাত্রার। অর্থাৎ এই মাত্রার বিকিরণে আমাদের বড় ধরনের কোনো ক্ষতি হবে না। তবে বিকিরণের মাত্রা কি ৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত একই থাকে?

বন্ধুদের বললাম যে তোমাদের অসুবিধা হলো আমাদের তথ্যের উৎস। পারমাণবিক শক্তির নিরাপত্তায় এখন প্রায় তিনটি আন্তর্জাতিক সংস্থা জড়িত এবং তাদের সবার অনুমতি পাওয়ার পরই এ ধরনের বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদন শুরু হয়। আর তারা সবাই এর সুরক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত। প্রযুক্তির উৎস নিয়ে তোমাদের যত কথা, তা খুব একটা সঠিক তথ্যনির্ভর নয়। তাদের শংকার কারণ কিন্তু আমাদের দুধ নয়। তাদের শংকার কারণ পারমাণবিক চুল্লিতে দুর্ঘটনা। যা ঘটেছে চেরনোবিল ও ফুকুশিমায়। মজার কথা হলো, সংবাদমাধ্যম ভুলে যায় যে যুক্তরাষ্ট্রের তিন মাইল দ্বীপেও ১৯৭৯ সালে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল। সেই দুর্ঘটনায়ও একটি চুল্লি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত তাই সেই কেন্দ্রের আশেপাশে বসবাসকারী ৩০ হাজার লোককে যুক্তরাষ্ট্র নজরদারিতে রেখেছিল।

বিপদ কিন্তু দুর্ঘটনায় নয়, বিপদ হয় দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণের ব্যর্থতায়। তাই দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণের ব্যর্থতা নিয়ে আমার চিন্তা অনেক। অনেকটা ঢাকার রেলগেটের দুর্ঘটনাগুলোর মতো। গেট ও গেটম্যান থাকা সত্ত্বেও কেন দুর্ঘটনা ঘটে, ভেবেছেন কি? আমাদের দুর্নীতিই শেষ পর্যন্ত না আমাদেরকে ডোবায়! ছোট হোক বড় হোক, বিষয়টি শেষ পর্যন্ত দুর্নীতির। তাই পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রে আমার ভয়, তার কাঠামোগত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় নয়; আন্তর্জাতিক সংস্থা হয়তোবা সব নিয়ম চালু করল কিন্তু শেষ পর্যন্ত গেটম্যানটা তো আমাদেরই একজন! তাই বালিশের গল্প আমাকে শংকিত করে। আমাদের দুর্নীতির মাত্রা দেখে খোদ প্রধানমন্ত্রীই বিব্রত। কোন প্রতিষ্ঠানটি দুর্নীতির বাইরে রয়েছে?

আমার ত্রিনিদাদের বন্ধু জানালেন তার হতাশার কথা। তাদের দেশ থেকে শত শত কর্মী যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার খামারে কাজ করতে যান। কিন্তু কভিডের কারণে তারা আটকে গেছেন কানাডা বা যুক্তরাষ্ট্রে। তার ভাষায়, সরকার দেশে কভিড ঠেকাতে গিয়ে তাদের দেশে আসতে দেয়নি। এক বছরের বেশি সময় তারা আটকে আছেন ওখানে। মানবেতর জীবন যাপন করছেন অনেকেই। যে সঞ্চয় লাভের জন্য তারা গিয়েছিলেন, এখন সেই সঞ্চয় তারা সেখানেই খরচ করে ফেলেছেন। সে বিব্রত। মনে মনে ভাবলাম সেই তুলনায় আমাদের গর্ব করা উচিত। আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি আটকে পড়া বাংলাদেশীদের দেশে আনতে। আমরা সাহস করে বলেছি যে আমরা তাদের ফিরিয়ে আনব।

সেই সঙ্গে ত্রিনিদাদে আসছে শরণার্থী। কী বলো, কোথা থেকে আসছে? আসছে ভেনিজুয়েলা থেকে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির উপহার। ট্রাম্প চাইছিলেন মাদুরো সরকার পরিবর্তনের আর তার ফলে এখন শরণার্থী আসছে ত্রিনিদাদ আর কলম্বিয়ায়। বিপদে আছে প্রতিবেশী তিন দেশ—কলম্বিয়া, ত্রিনিদাদ ও গায়ানা। কিন্তু উসকে দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য। সঙ্গে ছিল ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও কানাডা। জিজ্ঞেস করলাম কী পরিমাণ শরণার্থী এসেছে? ৪০ হাজার। আমি কিছু বলার আগেই আমার এক কানাডীয় বন্ধু বলে উঠল বাংলাদেশে রয়েছে ১০ লাখ শরণার্থী! শরণার্থীর একই দৃশ্য পাবেন সিরিয়ায়। যারা উসকে দিয়েছিল তারা এখন হাত গোটাচ্ছে আর নির্বোধেরা আটকে আছে শরণার্থী শিবিরে। যাহোক, বুঝতেই পারছেন যে বিপুল পরিমাণ শরণার্থী লালন করেও আমরা এখনো ভেঙে পড়িনি। আমাদের অর্থনীতি সংকটে ডুবে যায়নি। আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলতেই হবে।

অর্থনীতির তত্ত্ব কথায় আমরা যতই বলি না কেন যে উৎপাদনের মূল মন্ত্র তার উপকরণ কিন্তু আমরা ভুল করি তখনই, যখন উপকরণ বলতে আমরা কেবল পুস্তকি ভাষায় ভাবি জমি, শ্রম, মূলধন ও উদ্যোক্তাকে। উৎপাদনের চারটি উপকরণ। আমরা যদি মনে করি এই চারটি উপাদান থাকলেই উৎপাদন স্বাভাবিক থাকবে, তবে তা হবে ভুল। উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত আমাদের সমাজ, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, বিচারিক প্রতিষ্ঠান, প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান। এর একটিতে ভাঙন হলে আস্তে আস্তে সবগুলোই ভেঙে পড়বে

আমার এন্টিগুয়ার বন্ধুটি ক্রিকেট ভক্ত। নিজেও ক্রিকেট খেলে। বললাম, তোমাদের দল এখন আমাদের দেশে। সে বলল, আর বলো না। তার চোখেও হতাশা। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ভালো করছে না, তা তারা জানে। বলল, প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করলে এ রকমই হয়! বুঝলাম না। বলল, আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। অর্থনীতির তত্ত্ব কথায় আমরা যতই বলি না কেন যে উৎপাদনের মূল মন্ত্র তার উপকরণ কিন্তু আমরা ভুল করি তখনই, যখন উপকরণ বলতে আমরা কেবল পুস্তকি ভাষায় ভাবি জমি, শ্রম, মূলধন ও উদ্যোক্তাকে। উৎপাদনের চারটি উপকরণ। আমরা যদি মনে করি এই চারটি উপাদান থাকলেই উৎপাদন স্বাভাবিক থাকবে, তবে তা হবে ভুল। উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত আমাদের সমাজ, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, বিচারিক প্রতিষ্ঠান, প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান। এর একটিতে ভাঙন হলে ধীরে ধীরে সবগুলোই ভেঙে পড়বে। এই ধ্রুব সত্যটি আমাদের তাত্ত্বিক অর্থনীতিতে সঠিকভাবে তুলে ধরা হয় না। আমরা কেবলই মনে করি উৎপাদন হয় চারটি উপকরণের মাধ্যমে। তা নয়। আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক উপকরণগুলোর ক্ষয় রোধ করা জরুরি। অন্যথায় আমাদের অর্থনীতির গতি থমকে যাবে।

আমাদের ইচ্ছা এখন জাগ্রত। আমরা ভাবছি উন্নত দেশ হব। আমাদের মনোবল এখন রয়েছে। আমরা আজ যা চিন্তা করতে পারছি তা আমাদের আগের প্রজন্ম ভাবতেই পারেনি। এই সেদিনও আমাদের অর্থমন্ত্রীরা মার্চ মাসে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন। দাতাদের টাকার ওপর নির্ভর করে আমাদের বাজেট প্রণীত হতো। সেই দিনের কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে, তবে আরো পরিবর্তন প্রয়োজন। একটি আত্মনির্ভর উন্নয়নশীল দেশ হতে গেলে আমাদের সবার সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান রক্ষা করতে হবে। সেই সঙ্গে প্রয়োজন পড়বে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ার। যাদের উপস্থিতি ও কর্ম আমাদের ভবিষ্যৎকে মর্যাদাপূর্ণ করবে, অন্যথায় রেলগেটের মতো দুর্ঘটনা ঠেকানো যাবে না।

ড. এ. কে. এনামুল হক: ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির অর্থনীতির অধ্যাপক পরিচালক, এশিয়ান সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট